ইসলাম : শোষক শ্রেনীসমূহের মতাদর্শ ও হাতিয়ার

নাসরীন জাযায়েরি

পূর্ববর্তী পর্বের পর .....

১. সমকালীন ইসলামি আন্দোলনসমূহের বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি, অবস্থান, রাজনৈতিক কর্মসূচি ও রাজনৈতিক রনীতি

নিজেদের চিন্তাধারার তাত্ত্বিক কাঠামো নির্মাণ করা, জনসাধারণকে সমাবেশিত করা এবং তাদের কর্মসূচিকে বৈধতা দেবার জন্য ইসলামি আন্দোলনের রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত নেতৃবৃন্দ অজস্র বিশিষ্ট ধারণা ব্যবহার করে থাকে। ইসলামের মৌলিক ধারণা ও সুদূর অতীতের কেচ্ছা-কাহিনীর স্রেফ ব্যবহার মরিয়া হয়ে ওঠা ব্যাপক জনসাধারণের চোখে নিজেদের মতাদর্শ ও কর্মসূচির প্রকৃতিকে রহস্যাবৃত করে তুলতে তাদেরকে সক্ষম করে তোলে। এই রহস্যজাল ছিন্ন করা এবং এর মাধ্যমে সাদা চোখের সামনে তাদের বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গী ও শ্রেণীচরিত্রের একেবারে জাগতিক চেহারাটা মেলে ধরা খুবই জরুরী : তাদের বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গী, আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং কর্মতৎপরতা মুসলিম সমাজের নির্দিষ্ট শ্রেণীশক্তির প্রতিনিধিত্ব করে।

বস্তুত, ঠিক এখান থেকে অর্থাৎ শ্রেণীর প্রশ্ন থেকে শুরু করা যাক।

উম্মা

সকল সমাজই শ্রেণীবিভক্ত, দুনিয়ার সকল অংশের লোকেরাই সর্বাগ্রে উৎপাদনের প্রধান প্রধান উপকরণের সাথে সম্পর্কের ভিত্তিতে বিভিন্ন সামাজিক বর্গে বিভক্ত - আমাদের সময়কার এই নিষ্ঠুর বাস্তবতার কোন স্থান হয় নি এসব আন্দোলনের চিন্তার কাঠামোতে। শ্রেনীর বদলে ইসলামি চিন্তাধারায় রয়েছে উম্মা : শ্রেণীগত অবস্থান নির্বিশেষে ধর্মবিশ্বাসীদের এক সমাজ। সমাজ যে বৈরি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ সম্বলিত স্পষ্ট নির্দিষ্ট বৈরি শ্রেণীতে বিভক্ত, উম্মা'র ধারণা ঐসত্যকে আড়াল করে। বড় ভূস্বামী, শিল্পপতি এবং ব্যবসায়ী, সেই সাথে যাদের হারাবার কিছুই নেই সেই সর্বহারা এবং গরীব কৃষক সাধারণ-সংক্ষেপে শোষক ও শোষিত একই ইসলামি উম্মা'র অংশ হতে পারে।

ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মদের নেতৃত্বে যারাই ক্ষমতার জন্য লড়াইয়ে তাঁর সাথে যোগ দিয়েছিলেন তাদেরকে উম্মা'র অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। তাঁর ক্ষমতাদখলের একেবারে শুরুতে সেই সময়ের রাজনৈতিক চাহিদা অনুসারে উম্মা'র গঠন কাঠামো বদলেছে। মক্কায় স্বীয় প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধে উম্মা'র অংশ হিসেবে তিনি মদিনার ইহুদিদেরকেও ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। এমনকি তখনও তাঁর উম্মা শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আরব বেদুইনদের নিয়ে যে নতুন সমাজ তিনি গড়ে তুলেছিলেন সে সমাজকে পরিচালনার জন্য মুহাম্মদ ও তাঁর সহকর্মীগণ কোরআন (ইসলামি ধর্মগ্রন্থ) লিখেছেন। কোরআন সুস্পষ্টভাবে উম্মা'র মধ্যকার শ্রেণী ও সামাজিক ব্যবধানকে প্রকাশ করেছে : সেখানে ছিল সম্পত্তিবান ও সম্পত্তিহীন মানুষ, দাস ও দাসমালিক, ছিল উচ্চতর সামাজিক ও অর্থনৈতিক মর্যাদাসম্পন্ন যোদ্ধা যারা যুদ্ধ জয়ের লুণ্ঠিত দ্রব্যের ভাগ পেতো, আর ছিল কৃষিজীবী ও পশুপালক। আর

ছিল উম্মা ও উম্মাবহির্ভূতদের মধ্যকার বড় ধরনের বিভাজন : উম্মাযোদ্ধারা তাদের হাতের বন্দিদের দাস বানাতে পারতো এবং তাদের নারীদের রাখতে পারতো উপপত্নী হিসেবে। সে ছিল এক জঘন্য সমাজ। মুহাম্মদ নতুন রাষ্ট্রক্ষমতা গড়ে তোলেন এবং শোষনের নতুন সম্পর্ক বলবৎ করা এবং যুদ্ধে পরাজিত ও প্রসারমাণ ইসলামি সাম্রাজ্যের অধিভুক্ত করে নেয়া পরদেশী জনসাধারণের উপর আধিপত্যের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করার জন্য নতুন ধর্ম সংগঠিত করেন। সাম্প্রতিক সময়ে ইসলামি আন্দোলনগুলো যে উম্মা'র ধারণাকে ব্যবহার করেছে তা জনসাধারণকে তাদে পতাকাতলে সমবেত করার জন্য এবং এই পতাকা ও কর্মসূচির পেছনে শ্রেণীস্বার্থকে আড়ালে রেখে তাদের উদ্দেশ্যকে বৈধতা দান করার জন্য।

উম্মা'র ধারণাটি কেবল শ্রেণী সমন্বয়বাদী নয়, অবৈজ্ঞানিকও। এই শব্দটি যখন প্রথম চালু করা হয় তখন আধুনিক শ্রেণী যেমন পুঁজিপতি এবং সর্বহারার অস্তিত্ব ছিল না ; তেমনি ছিল না উপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বা নিপীড়িত ও নিপীড়ক জাতি।

তীক্ষ্ণ ও বৈরি শ্রেণী-স্বার্থের ব্যাপারটিকে আড়াল করার ঘটনা নতুন কিছু নয়। শ্রেণীবিভিক্ত সমাজের গোটা ইতিহাস জুড়ে ক্ষমতা ও শ্রেণী শাসনের তাগিদে সুবিধাভোগী শ্রেণীগুলো বঞ্চিতদেরকে এই মিথ্যা কথাটা বলে এসেছে যে, "আমার স্বার্থই তোমাদের স্বার্থ"। এটা এমন এক ধরণের ধোকাবাজি যা সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো এবং প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্রগুলো সবসময়ই ব্যবহার করে থাকে। আঠারো শতকের ইউরোপের উদীয়মান বুর্জোয়ারাও তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের 'সর্বজনীনতা'র ঘোষনা দিত। আর নিপীড়িত জাতিসমূহের ভেতরকার ছোট বুর্জোয়া ও ভুস্বামী শ্রেণীগুলোর রাজনৈতিক প্রতিনিধিরা ক্ষমতার কাঠামোয় ভাগ বসাবার আকঙ্ক্ষায় জনসাধারণের আস্থা অর্জনের জন্য এই লাইন প্রয়োগ করে। এটা জনসাধারণের ঘাড়ে চড়ে ক্ষমতায় ফিরে যাওয়ার জন্য ক্ষমতা থেকে উৎখাত হয়ে যাওয়া প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলোর একটা উপায়। উম্মা'র ঐক্য বলে একটা বিষয়ের অস্তিত্ব রয়েছে যার একমাত্র অর্থ হলো - জনগণ মোল্লাদের অধীনে থাকা।

বিশ্বউম্মা ঐক্য

ইসলামি আন্দোলনগুলো উম্মা'র ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক ঐক্যের ডাক দেয়। প্রথমত, এটা একটা অসম্ভব প্রকল্প কারণ ইসলামি উম্মা গন্ডায় গন্ডায় বিভক্ত : ইসলাম একেবারে সূচনা থেকেই নানা শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত হয়ে এসেছে। ইরানের ইসলামি প্রজাতন্ত্র এবং তার স্বধর্মীয় ভাই আফগানিস্তানের তালেবানদের দিকে লক্ষ্য করুন, এরা একে অপরের গলায় ছুরি বসাতে উদ্যত। ইরানের অভ্যন্তরে শিয়া শাসকদের হাতে সুন্নীরা নিপীড়িত হচ্ছে। আফগানিস্তানে সুন্নী, ওহাবী ও শিয়াপন্থী ইসলামি দলগুলো একে অপরকে হত্যা করছে। লেবাননে, হেজবুল্লাহরা ('হেজবুল্লাহ' মানে হচ্ছে আল্লার দল এবং এটা ইসলামি মৌলবাদীদের আরেকটা সাধারণ নাম) দাবি করছে যে তারা ফিলিস্তিন মুক্তির জন্য লড়াই করছে ; কিন্তু তারা লেবাননের ফিলিস্তিনি উদ্বাস্তুদের ছায়া মাড়াতে পারে না, কারণ ফিলিস্তিনি মুসলমানরা হচ্ছে সুন্নী আর হেজবুল্লারা হলো শিয়া। দ্বিতীয়ত, ইসলামি আন্তর্জাতিক ঐক্য হলো প্রতিক্রিয়াশীল ঐক্য। এটা জনগণকে অতিপ্রাকৃতিক অস্তিত্বে বিশ্বাস করার এবং ১৪০০ বছর আগে স্থাপিত বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে ঐক্যবদ্ধ হবার ডাক দেয়। এটা প্রতিক্রিয়াশীল কারণ তা বিশ্বের নিপীড়িত জনঘোষ্ঠীসমূহ, যাদের রয়েছে একই সাধারণ শত্রু বিশ্বসাম্রাজ্যবাদ, তাদেরকে পূর্বপূরুষের ধর্ম বিশ্বাসের ভিত্তিতে বিভক্ত করে। ইসলাম এমনকি একটি মাত্র দেশেও সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যকারীর বিরুদ্ধে নিপীড়িত জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারে না, আন্তর্দেশীয় ঐক্যতো দূরের কথা। নিপীড়িত জাতিসমূহের মধ্যে রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মীয়

ঐতিহ্যের অধিকারী জনগোষ্ঠী। ফিলিস্তিনের দিকে লক্ষ্য করুন : সেখানে ফিলিস্তিনি জনগণের মধ্যে মুসলমানের পাশাপাশি খ্রিষ্টানরাও রয়েছে। হামাস (ফিলিস্তিনি ইসলামি দল) কীভাবে সাধারণ শত্রু উপনিবেশবাদী ইসরায়েলের বিরুদ্ধে সমগ্র ফিলিস্তিনি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারে? এটা হয়নি এবং হবেও না। প্রকৃতপক্ষে এটা হলো তেমন ঐক্যের পথে একটা বাধা। মিশর, ইরান, পেরু, স্পেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের সর্বহারাদের অবশ্যই সাধারণ শত্রু ও সাধারণ ভবিষ্যতের ভিত্তিতে ঐক্য হতে হবে ; কিন্তু তারা নিজ দেশের পুঁজিপতি ও বড় বড় সামন্তদে র সাথে কখনই কোনো ভিত্তিতেই ঐক্যবদ্ধ হতে পারবে না ও হওয়া উচিত নয়, তা সে ধর্মীয় বা অন্য কোন ধরনের বাস্তব বা কাল্পনিক "ঐতিহ্য"-এর ভিত্তিতেই হোক না কেন। ইসলামি আন্তর্জাতিক ঐক্যের আহ্বান সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর বিশেষত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দাবার ঘুঁটিতে পরিণত হবে। এরাই আজ পাশ্চাত্যের জনগণকে ডাক দিচ্ছে 'সভ্যতার সংঘাত'-এর ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য - ইহুদি, খ্রিষ্টান ঐতিহ্যের ভিত্তিতে পশ্চিমা সভ্যতা বনাম অন্যান্য যেমন 'ইসলামি সভ্যতা', 'চীনা সভ্যতা' ইত্যাদি।

পরিহাসের বিষয় এই যে উম্মা'র প্রচারকরা সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এবং প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্রগুলোর সাথে সহজে ও অনায়েসে রাজনৈতিক লেনদেন ও ঐক্যে প্রবেশ করে। উদাহরণ হিসেবে, ইসলামি আন্দোলনের মাধ্যমে জন্ম নেওয়া প্রথম সাম্প্রতিক রাষ্ট্র ইরানের ইসলামি প্রজাতন্ত্রের কথাই ধরা যাক। মার্কিনি প্রেসিডেন্ট রেগান একবার মন্তব্য করেছিল, "মোল্লারা আমাদের বন্ধু"। সে ঠিকই বলেছিল। এই শাসকগোষ্ঠীর অধীনে পেট্রোলিয়ামের প্রবাহ এমনকি একদিনের জন্যও বন্ধ থাকেনি, যে পেট্রোলিয়াম হলো বিশ্বপুঁজিবাদী ব্যবস্থার সাথে ইরানের সংযুক্তির আংটা বিশেষ। আয়াতুল্লাহ খোমেনির নেতৃত্বাধীনে ইরানের ইসলামি প্রজাতন্ত্র পশ্চিমা কোম্পানিগুলোর তেল সম্পদ লুণ্ঠন বন্ধের জন্য পেট্রোলিয়াম শ্রমিকদের প্রচেষ্টাকে দমন করে এবং আজ দুই দশকের বেশি সময় পরেও আন্তর্জাতিক বাজারে তেল বিক্রির উপরই ইরানের অর্থনীতি ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল, এই বিক্রি বছরে ২০০০ কোটি মার্কিন ডলারের উপরে। যদিও আপাত দৃষ্টিতে ইরানের ইসলামিক প্রজাতন্ত্রের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক ছিন্ন রয়েছে তবু ইরান ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোর মাধ্যমে বিশ্বসাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা ও পুঁজিবাদী শক্তিগুলো সেবা করে গেছে। নিকারাগুয়ার জনগণ এবং সান্দিস্তা প্রশাসনের বিরুদ্ধে কুখ্যাত কন্ট্রাদের (৪) অর্থনৈতিক সাহায্য করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সি আই এ-এর সাথে যৌথ গোপন তৎপরতা চালিয়েছে। ইরানের বিপ্লবী শক্তিকে "ইহুদিবাদের চর" হিসেবে নিন্দাবাদ জানানোর পাশাপাশি ইসরায়েল সরকারের সাথে সম্পর্ক বজায় রেখেছে।

অন্যান্য দেশের ইসলামি জঙ্গি গ্রুপগুলোর ক্ষেত্রেও এই একই কথা খাটে। যেমন আফগানিস্তানের পাঁচমিশালি ইসলামি শাসকদের কথাই ধরা যাক। এরা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এবং অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্র যেমন পাকিস্তান ও সৌদি আরবের ঘনিষ্ঠ মিত্র ছিল। আলকায়দার বিন লাদেনের মতে যতদিন পর্যন্ত সৌদি আরবের মাটিতে মার্কিন সেনাবাহিনী ঘাঁটি স্থাপন করেনি ততদিন পর্যন্ত সৌদি বাদশা উম্মা'র অংশ ছিল। বিপ্লবী কমিউনিস্টদের মতে। সৌদি বাদশা হচ্ছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পাচাটা এবং ১৯৯০-এ মার্কিন সেনাবাহিনী সেখানে গেঁড়ে বসার পরে কিংবা অনেক আগে থেকেই সৌদি আরব হলো যুক্তরাষ্ট্রের নয়া উপনিবেশ। আর আমাদের কথা বলতে গেলে, সৌদি রাজপরিবার এখনও উম্মা'র অংশ কিনা সেটা বিবেচনার কোনো বিষয় নয়। সৌদি শাসকবর্গ কখনই জনগণের অংশ ছিল না, হবেও না এবং তাদেরকে ভয়ংকর শোষকদের একটা দঙ্গল হিসেবে অবশ্যই উৎখাত করতে হবে।

নিজ দেশের শাসকদের কাছ থেকে এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমুহের কাছ থেকে অধিকতর সুবিধা পাওয়ার সংগ্রামে নিয়োজিত সামন্ত ও বড় বুর্জোয়া শ্রেণীগুলোর উম্মা সংক্রান্ত ধারণা প্রতিক্রিয়াশীল যুক্তফ্রন্টের রণনীতি হিসেবে কাজ করে।

ইসলামি আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ উম্মা'র ধারণাটিকে (বা যুক্তফ্রন্টের রণনীতিকে) কিছুটা সাফল্যের সাথে ব্যবহার করেছে। এটা শ্রমিক, কৃষক এবং সকল নিপীড়িতদের জন্য ক্ষতিকর হলেও এই সফলতার একটা ভিত্তি রয়েছে। (এ সকল সমাজে আধিপত্যশালী আধা-সামন্তবাদী কাঠামোর সাথে যুক্তভাবে উপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা) মুসলমান সমাজের উপর জাতীয় পরাধীনতা নিপীড়িত জনসাধারণের মাঝে উম্মা'র রণনীতির কিছু অনুসারী লাভের বস্তুগত ভিত্তি যোগায়। খোদ আধা-সামন্তবাদী কাঠামোর অর্থই হলো জনগণের মধ্যে গোত্রগত এবং ধর্মীয় বন্ধনের প্রভাব এখনো বিদ্যমান।

নিপীড়িত জাতিসমূহের ভেতর রাজনৈতিক আন্দোলনে শ্রেণীর ধারণা নিয়ে আসাকে ইসলামি শক্তিগুলো (এমনকি ইহজাগতিক জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলোও) সব সময়ই নিন্দাবাদ জানিয়ে আসছে, কারণ তারা নিজেরা শ্রেণীগত শোষন নিপীড়নের বিরুদ্ধে নয়। তারা সামন্ত ভূস্বামীদের জমির মালিক হবার এবং তার ভিত্তিতে গরীব ও ভূমিহীন কৃষকের শোষণ করার অধিকারকে উর্ধ্বে তুলে ধরে ; তারা উৎপাদনের উপায়সমূহের উপর পুঁজিবাদি মালিকানাকে ও শ্রমিক শোষণকেও উর্ধ্বে তুলে ধরে, যার মাঝে সবচেয়ে জাজ্বল্যমান হলো পুরুষের কাছে নারীদের অধীনতা। এই ইসলামি শক্তিগুলো সাম্রাজ্যবাদকে পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর বিবেচনা করে না। তারা পশ্চিমা শক্তিগুলোকে তখনই 'সাম্রাজ্যবাদী' বলে যখন এই সকল শক্তি তাদের স্ব স্ব নিপীড়ক সমাজ ব্যবস্থা চালিয়ে যাবার যথেষ্ট সুযোগ দেয় না।

বাস্তবতা হলো এই যে, এ সকল দেশের উপর সাম্রাজ্যবাদী নিপীড়ন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী যুক্তফ্রন্ট আবশ্যকীয় করে তুললেও অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে যে, সামন্ত-গোত্রীয় ও বুর্জোয়া শক্তিগুলোর নেতৃত্বাধীন এ রকম ঐক্য শেষপর্যন্ত শ্রমিক কৃষকদের স্বার্থ বিকিয়ে দেওয়া এমনকি জাতীয় বিশ্বাসঘাতকতায় পরিণত হতে বাধ্য। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী অতীব প্রয়োজনীয় জাতীয় ঐক্য সর্বহারা দূরদৃষ্টি, কর্মসূচি ও কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা সাম্রাজ্যবাদের অধীনস্থ দেশগুলোতে প্রতিটি খাঁটি বিপ্লবের জন্য বাঁচা মরার প্রশ্ন। ইসলামি শক্তি অথবা এমনকি ইহজাগতিক বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলো সাম্রাজ্যবাদী জোয়াল থেকে নিপীড়িত জাতিগুলোকে মুক্ত করতে পারে এমন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বিপ্লবী জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলতে ও নেতৃত্ব দিতে পারে না।

অভিজ্ঞতা আমাদেরকে যথেষ্ট দেখিয়েছে এই শক্তিগুলো বিপ্লবী শক্তি এবং শ্রমিক, কৃষক, নারী ও ব্যাপক প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবিদের দমন করার খাতিরে বরং সাম্রাজ্যবাদীদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হবে। ছোট দাস মালিক হিসেবে তারা সব সময় বড় দাসমালিকদের সাথে গাঁটছাড়া বাঁধার প্রবণতা দেখায়। ১৪০০ বছর আগে মক্কার মুহাম্মদ গোত্রগত বিভক্ত দূর করা ও আর উপদ্বীপে একটি ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ডাক দিয়েছিলেন। আজ ইসলামি সমাজগুলোর জনসাধারণ আদৌ আর বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত নয়। সামন্তবাদী ও পুঁজিবাদী শোষণের কারণে তারা শ্রেণীতে বিভক্ত এবং একই সাথে শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী জাতিসমূহ কর্তৃকও নিপীড়িত। এখন, এ সমস্ত বিভাজনকে অতিক্রম করতে হবে আর অতিক্রম করা যেতে পারে একমাত্র নয়া গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে।

ফেতনা : জনগণের বিদ্রোহ করার অধিকার নেই

ফেতনা (ভাঙ্গন ও চক্রান্ত) হচ্ছে আরও একটি ধারণা যা ইসলামপন্থীরা ব্যবহার করে থাকে। উম্মাকে বিভক্ত করার যে কোন প্রচেষ্টাকে বলা হয় ফেতনা। কাজেই বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ হচ্ছে সবচেয়ে বড় ফেতনা। উপরের সমস্ত কথাবার্তা ও যুক্তি হচ্ছে ফেতনা কারণ তা দেখিয়ে সে যে, উম্মা অবিভাজ্য কোনো সমগ্রতা নয়। যেমন ইরানের ইসলামি প্রজাতন্ত্রে শ্রমিক ধর্মঘট ও নিপীড়িত কুর্দীদের সংগ্রাম বা নিজস্ব অধিকারের নারীদের সংগ্রামকে বিশাল ফেতনা হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। নিজেদের হাতে নিজেদের ভাগ্য তুলে নেবার জনসাধারণের যেকোনও প্রচেষ্টাই শ্রমিক, কৃষক, বিপ্লবী, বুদ্ধিজীবি ও নারীদের রাজনৈতিক ময়দানে স্থান করে নেওয়ার উৎসাহব্যঞ্জক কর্মকান্ডকেই ফেতনা বা ইসলামের জন্য বিপজ্জনক হিসেবে দেখা হয়েছে। নিজের প্রতিক্রিয়াশীল শাসনকে সুসংহত করতে খোমেনি এই সবগুলো ফেতনাকে ধ্বংস করেছে।

খ্রিষ্টান ধর্ম ও ইহুদি ধর্মসহ অন্যান্য ইব্রাহিমী ধর্ম এবং সাধারণভাবে যেকোন ধর্মের মতোই ইসলাম ধর্মও সমালোচনা, উদ্ভাবন বা অন্য যা কিছু বন্ধ্যা, নির্বোধ ও জড় চিন্তাকে নাড়িয়ে দিতে পারে তার ব্যাপারে আতংকগ্রস্ত। মূর্তবিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের চিন্তাকে সহ্য করা হলেও সমাজ বিজ্ঞানের চিন্তাকে কখনো সহ্য করা হয় না। মানুষের বিবর্তন ও মানব সমাজের ইতিহাস এবং সর্বোপরি উৎপাদিকা শক্তি ও মানবজ্ঞানের বিকাশের একটা নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পর্বে মানুষ কর্তৃক ধর্ম ও ঈশ্বরের সৃষ্টি ইসলামি আন্দোলন ও গ্রুপগুলোর আলোচনার ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ বস্তু হিসেবে বিবেচিত। ইসলাম নিজেকে 'বিকশিত করা'র এবং আত্ম-সমালোচকমূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে নিজের সীমাবদ্ধতাগুলোকে সংশোধন করার কোনো প্রয়োজনীতা দেখে না। এর কারণ এই যে, অন্যান্য সকল ধর্মের মতোই ইসলাম দাবি করে যে তা সকল সময়ের জন্য সর্বব্যাপী। অপরিবর্তনীয় অনড় মতাদর্শ বনাম অব্যাহত পরিবর্তনশীল বিশ্ব ও বিকাশমান মানবজ্ঞানের ব্যাপারটা মোকাবিলা করা হয়েছে খ্রিষ্টীয় ইনকুইজিশন ধরনের ধারণাগুলোর মাধ্যমে, ইসলামি পরিভাষায় যাকে বলা হয় নিফাগ (ভাঙ্গন) বা কুফর (ঈশ্বরনিন্দা) (৫)। আধিপত্যশীল ইসলামি চিন্তাধারায় সৃজনশীল যে কোন কিছুকেই বলা হয় ভাঙ্গন বা বিদ্রোহ। এমনকি আলী (শরিয়তি) (শিয়া ধর্মের একজন সংস্কারক)(৬) অথবা ইরানের গণ মোজাহিদিন সংগঠন ধর্মের মতধারায় যে সামান্য 'উদ্ভাবন' অন্তর্ভুক্ত করেছিল খোমেনি তাও সহ্য করেনি। সে এদেরকে মুনাফিগীন (বিভক্তকারী) হিসেবে চিহ্নিত করে। প্রতিটি ইসলামি শাখায় এর নিজস্ব বিভক্তকারী রয়েছে এবং ইসলামের ইতিহাস জুড়ে ইসলামের বিভিন্ন শাখার মাঝে নিফাগ নিয়ে রক্তাক্ত যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছে। কাফের হচ্ছে এমন একটা শব্দ যা সেই সব 'বহির্ভূত লোকজন'-দের জন্য ব্যবহার করা হয় যারা ইসলামি নয় বা যারা ধর্মীয় চিন্তাকে সমালোচনা করে। ইসলামের মতে, যারাই এর স্তম্ভকে সমালোচনা করতে সচেষ্ট তারাই হলো কাফের এবং মৃত্যুদন্ড পাওয়ার যোগ্য। 'মধ্যপন্থি ইসলামি শক্তি' সমূহের দাবির বিপরীতে এই আইন কোরআনেই লিপিবদ্ধ রয়েছে। কমিউনিস্টরা হচ্ছে কাফের।

সমকালীন ইসলামি আন্দোলনের ইতিহাসের একটি কলঙ্কজনক অধ্যায় হলো আরব এবং আরব বহির্ভূত উভয়ধরনের ইসলামি দেশগুলোতে নামিদামী বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্যসেবী ব্যক্তিত্বকে হত্যা করা। যেমন ইরানের গোপন ইসলামি আন্দোলন কর্তৃক অর্ধশতাব্দী আগে কাসরাভীর হত্যাকান্ড ছিল এক জাতীয় শোকাবহ ঘটনা। তিনি ছিলেন আধুনিক সমালোচক ও ঐতিহাসিক ; ১৯০৫ সালের ইরানি শাসনতান্ত্রিক বিপ্লবের ইতিহাসের উপর তাঁর লেখা অসাধারণ বইগুলো হচ্ছে ইরানের জনগণের ইতিহাসের রত্নভান্ডার। খোমেনির সহযোগীরা তাঁকে হত্যা করে ; কারণ ধর্মীয় মতান্ধতা ও ইরানের প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মীয়

হাতিয়ারের তিনি ছিলেন সাহসী ও মুক্তকণ্ঠ সমালোচক। আজ ইরানের ইসলায় প্রজাতন্ত্র কর্তৃক সুপরিকল্পিত নিশ্চিহ্নকরণ বা জনগণের বুদ্ধিজীবীদেরকে দেশত্যাগে বাধ্য করা ইরানের জন্য এক জাতীয় বিয়োগান্তক বিষয়ে পরিণত হয়েছে, যদিও এর ব্যাপকতা এখনও বহুলাংশে অজানা। আরব দেশগুলোতেও হেজবুল্লাহ ধর্মান্ধ ব্যক্তিরা অনেক লেখক ও শিল্পীকে হত্যা করেছে। যেমন ১৯৮৭ সালে ডঃ হোসেন মোরাভাত, কয়েক সপ্তাহ পরে ডঃ মেহেদী আমলের গুপ্ত হত্যা ; বিখ্যাত ও দুঃসাহসী ফিলিস্তিনি কার্টুনিস্ট নাজি আলালির গুপ্ত হত্যা এবং ১৯৯০ দশকের শুরুর দিকে তুরস্কে তুরহান দুরসুন-এর গুপ্তহত্যা। এসকল বুদ্ধিজীবীকে ইহুদিবাদের সেবক বলে অভিযুক্ত করা হয় যদিও এঁদের হত্যাকান্ডটাই হচ্ছে ইসলামিদের জাতীয় বিশ্বাসঘাতকতার পরাকাষ্ঠা। এমন সব দেশবাসী থাকলে, ইহুদি উপনিবেশবাদীদের আর কী দরকার?

ইসালামি আইন অনুসারে মুনাফিগিনসহ যে সমস্ত মুসলমান অন্য ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে বা নাস্তিক হয়ে গেছে তারা মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত হওয়ার যোগ্য। খোমেনির শাসন আমলে হাজার হাজার কমিউনস্ট এবং মুজাহিদীন ধরনের মুসলমানদেরকে হত্যা করা হয়েছে। এদের সংখ্যা গরিষ্ঠ ছিলেন সেইসব বিপ্লবী যাঁরা শাহ্-এর শাসনকে উৎখাত করার জন্য লড়েছেন। ইরানের ইসলামি প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে যে সকল কমিউনিস্টরা সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়েছেন তাঁদেরকে দুই দফা মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয়েছে : একবার বিপথগামিতার জন্য আআর দ্বিতীয়বার আল্লার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের জন্য (মোহারেব বা খোদা)।

তাগলীদ : নেতা ও জনসাধারণ

তাগলীদ মানে জীবনের সর্বক্ষেত্রে মহান আয়াতুল্লাহকে (৭)-মেনে চলা। এটা হচ্ছে মূলত একটা শিয়াপন্থী ধারণা যদিও কিছু পরিবর্তনসহ ইসলামের অন্যান্য শাখাতেও এর অস্তিত্ব রয়েছে। এই প্রতিক্রিয়াশীল ধারণা অনুসারে জনসাধারণ হচ্ছেন ভেড়ার পাল যাদের প্রয়োজন রাখালের। এ থেকে বেরিয়ে আসে যে, জনসাধারণ সচেতনভাবে নিজেদের ভাগ্যকে নিজেদের হাতে তুলে নিন এবং নিজেদের স্বার্থে লড়াই করুন ইসলামি বিধানে তার কোন স্থান নেই। এই রাখালেরা হচ্ছে আয়াতুল্লাহ বা ইমাম (আয়াতুল্লাহদের দ্বারা বাছাইকৃত অন-অপসারণযোগ্য নেতা) যারা জনসাধারণের জন্য চিন্তা করা, তাদের জীবনের প্রতিটি খুঁটিনাটি বিচার করা, এবং কীভাবে জীবনযাপন করতে হবে সে ব্যাপ্রে নির্দেশনা দেয়ার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয়। তাগলীদ এবং ইমামের ধারণাগুলোর মানে হলো জনসাধারণ ও নেতার এই প্রতিক্রিয়াশীল সম্পর্ককে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া যেখানে নেতাদেরকে দুনিয়ার স্বয়ং আল্লার নিজস্ব লোক বলে গণ্য করা হয়। আমরা কমিউনিস্টরা যাকে বলে থাকি 'গণলাইন' অথবা 'জনগণই ইতিহাসের স্রষ্টা' ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে কারো পক্ষে এমন ধারণা কাছাকাছি কোনো কিছু কখনই খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। এমনকি তা উদীয়মান বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গির কাছাকাছি নয় যে দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে মানুষের সৃজনশীলতা রয়েছে, তারা যুক্তিসংগত ভাবে চিন্তা করতে পারে এবং ঈশ্বর বা চার্চের হস্তক্ষেপ ছাড়াই নিজেদের ভাগ্যের পরিবর্তন করতে পারে। ১৯৮০'র দশকের মাঝামাঝি সময়ে ইয়েমেনের রাজধানী সানার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ হামুদ আলডদী ইয়েমেনের প্রাচীন কৃষি ব্যবস্থার উপর তার গবেষণাগ্রন্থ প্রকাশ করে দেখান যে তা ছিল এ অঞ্চলের জনসাধারণের এক বিশাল সাফল্য বিশেষ। ইসলামি শক্তিগুলো তাকে নির্মমভাবে আক্রমণ করে, যারা দাবি করে এ পৃথিবীর সবকিছুই ঈশ্বরের সৃষ্টি ও কাজ। তাদের মতে পন্ডিত ইয়েমেনের জনসাধারণকে বাহবা দেওয়ার মাধ্যমে ধর্মদ্রোহিতার অপরাধ করেছেন। (দেখুন - **সাদিক জে আল আজ্‌ম্ লিখিত সালমান রুশদী এ্যান্ড ট্রুথ্ ইন লিটারেচার**)।

কাজেই প্রতিদিনকার কাজকর্মে জনসাধারণকে চড়িয়ে বেড়ানোর দায়িত্ব আয়াতুল্লাহদের উপর বর্তায়। প্রত্যেক আয়াতুল্লারই নিজস্ব গ্রন্থ রয়েছে, যেখানে তার অনুসারীদের প্রতিদিনকার ও দীর্ঘমেয়াদী কাজ কর্মের বিস্তারিত নির্দেশনা থাকে যার একটা বড় অংশই হলো নারীদের জন্য ও নারী বিরোধী নিপীড়নমূলক ও প্রতিক্রিয়াশীল নৈতিক আচরণবিধি ও অভিযোগনামা। এই পরজীবীরা যারা তাদের নিজেদের রুটিরুজির জন্য কখনই ঘাম ঝরায় না, তারা এসব বাকুয়াস ও ফালতু বিধিবিধান তৈরির জন্য ধর্মীয় তর্কবিতর্কে মেতে থাকে, যার লক্ষ্য হলো জনসাধারণকে বশীভূত রাখা ও অজ্ঞ করে রাখা।

জেহাদ ও শহীদীমৃত্যু

জেহাদ হলো ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ এবং তা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য প্রয়োজনীয়। এর অর্থ হলো জিহাদ ফি সাবিল আল্লাহ : আল্লার পথে যুদ্ধ করা। কিন্তু এটা কি, কার বিরুদ্ধে এ যুদ্ধ এবং পৃথিবীতে কী অর্জিত হবে এর মাধ্যমে? ফিলিস্তিনে জেহাদের প্রকৃতিটা কি? ফিলিস্তিনি কৃষক ও জনগণের কাছ থেকে উপনিবেশবাদীদের চুরি করে নেওয়া জমি জমা ফিরে পাবার জাতীয় যুদ্ধ না কি তা পবিত্র ভূমি ফিরে পাবার ধর্মীয় যুদ্ধ? আলজেরিয়ার জেহাদের অর্থ কী? কেন ঈশ্বর (অথবা তার প্রতিনিধিরা) জেহাদের নামে হাজার হাজার কৃষককে হত্যা করতে চায়?

যে কোনো যুদ্ধের লক্ষ্য এবং তা যেভাবে লড়া হয় তা থেকে কোন ধরনের সমাজ বেরিয়ে আসবে সেটা পরিষ্কার হয়ে উঠে। ইসলামি মৌলবাদীরা যেহেতু একেবারে গোড়ার দিকে ফিরে যেতে চায়, কাজেই আসুন আমরা মুহাম্মদের সময় কালকে লক্ষ্য করি। একেবারে জন্মলগ্ন থেকেই জেহাদ হচ্ছে অতি মাত্রায় রাজনৈতিক চরিত্র সম্পন্ন। নতুন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিশিষ্ট নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য মুহাম্মদ নয় বছরের মধ্যে ৬৫বার যুদ্ধ করেছিলেন। এই বিষয়ে কোরআনের বহু আয়াত এ সময়ে সূত্রায়িত হয়। পরবর্তীকালে, ইসলামের সামন্ত সাম্রাজ্য বিশ্বের অন্যান্য স্থানে প্রসারিত করার জন্য তার অনুসারীরা জেহাদ পরিচালনা করে। জনসাধারণকে স্থলবাহিনীর সৈন্য হিসেবে সমাবেশিত করার জন্য এবং ক্ষমতা অর্জনের কঠিন কাজে বৈধতা আনার জন্য তাঁকে যুদ্ধের প্রকৃতিকে ধর্মের আবরণে ঢেকে নিতে হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, স্বয়ং বিধাতা জেহাদের নির্দেশ দিয়েছে। তিনি স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী উভয়ধরনের বিভিন্ন পুরুস্কারের আশ্বাস দিয়েছিলেন : যারা জেহাদে অংশ নেবে কিন্তু নিহত হবে না তারা পাবে যুদ্ধে লুণ্ঠিত দ্রব্যাদির একটা ভাগ ; আর যদি কেউ জেহাদে নিহত হয় তাহলে সে সরাসরি বেহেশতে চলে যাবে। এটার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে। বেহেশতে অবশ্যই 'উন্নততর' নানা ধরনের বস্তুগত সম্পদ রয়েছে, যার মধ্যে আছে পুরুষদের জন্য অনেক 'কুমারী নারী' এবং অল্প বয়সী বালক। এটা স্পষ্টতই ফি সাবিল আল্লাহ্‌র সৈন্যদেরকে লোভ দেখানো ও ঘুষ দেওয়া ছাড়া অন্য কিছু না। জেহাদে পরাজিতরা যদি তাদের জরিমানা দিতে অস্বীকার করে তাহলে তাদেরকে হত্যা করা হবে এবং তাদের সন্তানদেরকে দাস হিসেবে নিয়ে নেওয়া হবে। এ হচ্ছে জেহাদ-প্রতিশ্রুত সমাজের ধরন।

"যুদ্ধ হচ্ছে অন্যরূপে রাজনীতির ধারাবাহিকতা", 'শ্রেণীযুদ্ধ' এবং 'জাতীয় যুদ্ধ' প্রভৃতি আধুনিক ধারণাগুলোর একটিও ইসলামি চিন্তাধারার মধ্যে দেখা যায় না। সেখানে একমাত্র যুদ্ধ হচ্ছে 'বিশ্বাসী' এবং অন্যান্যদের মধ্যকার যুদ্ধ : দার-আল-হার্ব এর বিরুদ্ধে দার-আল-ইসলাম (অবিশ্বাসীদের দেশের বিরুদ্ধে ইসলামের দেশ) এর মধ্যকার যুদ্ধ। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, ইসলামি মৌলবাদী আন্দোলনসমূহের জেহাদে বা কারণেই তাদের অন্যান্য রণনীতিতে কোন রাজনৈতিক লক্ষ্য নেই। মরিয়া জনসাধারণকে বোকা বানানোর জন্যই অস্পষ্টতা বজায় রাখা হয়। স্পষ্টতই, আফগানিস্তানে সোভিয়েত বিরোধী যুদ্ধের

সময় সেখানে আফগানিস্তানের মুজাহিদীন এবং ওসামা বিন লাদেন জনসাধারণকে বলত যে তারা "আল্লাহর জন্য যুদ্ধ করছে"। তারা যে "সি আই এ'র জন্য যুদ্ধ করছে" সে সত্যটি কখনোই বলতো না। তারা যত লম্বা চওড়া কথাবার্তা বলুক আর গলাবাজি করুক না কেন, বিন লাদেন ও ইরানের ইসলামি প্রজাতন্ত্র সবসময় বিশ্বের বড় বড় প্রতিক্রিয়াশীলদের স্থলযোদ্ধা হয়েই থাকবে।

কিছু কিছু ইসলামি গ্রুপ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে জেহাদের ডাক দিয়ে আসছে, কারণ সাম্রাজ্যবাদীরা হচ্ছে 'ধর্মহীন' যারা ইসলামি দেশগুলোর উপর আধিপত্য চালিয়েছে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জেহাদের এ লড়াই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াইয়ের প্রহসন ছাড়া আর কিছুনা। এর সাথে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে পরিচালিত সফল যুদ্ধসমূহের কোনো সম্পর্ক নেই : যেমন ১৯১৭ সালের মহান রুশ বিপ্লব ; সাম্রাজ্যবাদী জাপানের এবং মার্কিনি পুতুল শাসকদের বিরুদ্ধে চীনা যুদ্ধ, যা ১৯৪৯ সালের চীন বিপ্লবের নির্ধারক বিজয় এনে দেয়, ১৯৫৩ সালের কোরিয়ার যুদ্ধে কোরিয়ার জনগণ ও চীনা লাল ফৌজের হাতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের বিরাটাকার পরাজয় এবং শেষত ভিয়েতনামীদের হাতে মার্কিন সেনাবাহিনীর শোচনীয় পরাজয়। আজ পেরু ও লেপালের মুক্তিকামী গণযুদ্ধ, গণযুদ্ধের বিজয়ী রণনীতির ভিত্তিতে আঁকাবাঁকা পথ ধরে বিকশিত হচ্ছে। আর ইতিমধ্যেই চূড়ান্ত বিজয়ের আগেই লাল ঘাঁটি এলাকা প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছে যেখানে জনসাধারণ তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগ করেছে। গণযুদ্ধের বিজয় কোনো ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে না, করে জনগণের উপর। তা নির্ভর করে সর্বহারা শ্রেণী কর্তৃক বিংশ শতাব্দীতে বিকশিত ও অনুশীলনে পরীক্ষিত এক রণনীতির উপর, এই রণনীতির সৃজনশীল প্রয়োগ ও তাতে বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের উপর আর জনগণের সৃজনশীলতা ও দুঃসাহসের উপর।

সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর বুকে ভীতি সঞ্চার করার বদলে ইসলামি মৌলবাদীদের জেহাদ বরং ব্যাপক জনসাধারণের উপর সন্ত্রাস সৃষ্টিতেই প্রধানভাবে সফল হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে ইরান, আফগানিস্তান ও আলজেরিয়ার কথাই ধরা যাক। মধ্যপ্রাচ্যের এই দেশগুলোতে শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ইসলামি গ্রুপগুলোর জেহাদের ফলে কতজন আলজেরীয় সৌদি বা মিশরীয় সেনানায়ক সাধারণ সেপাই নিহত হয়েছে অথবা মধ্যপ্রাচ্যের সাম্রাজ্যবাদী দখলদার বাহিনীর কতজনই বা মারা গেছে? মোটেই খুব বেশি নয়। অপরদিকে ১৯৮৭ সালে খোমেনির দ্বারা রাজবন্দিদের গণহারে হত্যা করা, ইরানে কুর্দী জনগণের উপর পরিচালিত হত্যাযজ্ঞ, সংখ্যালঘু ধর্মীয়গ্রুপ যেমন বাহাইদের এলাকায় ব্যাপক লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগ, প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবিদের গুপ্ত হত্যা ও তাদের রচনাবলি নিষিদ্ধ করা, আর আলজেরিয়ার ইসলামি সেলভেশন ফ্রন্ট (এফ আই এস) কর্তৃক কিছু গ্রামের জনসাধারণের উপর ব্যাপকভাবে পরিচালিত হত্যাযজ্ঞ ইত্যাদি। আফগানিস্তানে তালেবান ও উত্তরাঞ্চলীয় জোটের পরস্পরের এলাকায় গত এক দশক ধরে পরিচালিত নির্বিচার গণহত্যা, নারী ও ছোট ছোট মেয়েদেরকে জেহাদের উপঢৌকন হিসেবে, আলহামদুলিল্লাহ-সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, ধর্ষণ করা। ইরাক ও ইরানের মধ্যকার যুদ্ধ, দখলদার সোভিয়েত বাহিনীর বিরুদ্ধে পরিচালিত আফগান মুজাহিদীনের পরিচালিত যুদ্ধ-গত দুই দশকের এসব বড় বড় জেহাদ পরিচালিত হয়েছে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর অস্ত্রভান্ডার থেকে যোগান দেওয়া 'ঈশ্বর প্রদত্ত' উন্নত যুদ্ধাস্ত্র দিয়ে এবং স্যাটেলাইটের মাধ্যমে সরবরাহকৃত নানা গোয়েন্দা তথ্যের সাহায্যে। জেহাদকে যা চরিত্রের দিক থেকে প্রতিক্রিয়াশীল বানিয়ে ফেলে তা সশস্ত্র যুদ্ধ পরিচালনা নয়। বিশ্বের ঘটনাবলী যথেষ্ট পরিমাণে দেখিয়েছে যে বন্দুকের নল থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতা বেরিয়ে আসে। জেহাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক উদ্দেশ্য এবং যেভাবে তা পরিচালিত হচ্ছে তাই তাকে প্রতিক্রিয়াশীল করে তোলে (৮)।

১৯৮০'র দশকে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের জন্য এবং ইসলামি শরীয়া ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামি মৌলবাদী আন্দোলনগুলো জেহাদের ডাক দিয়েছিল। কিন্তু তাদের এ আহ্বান কিছুটা মাত্রায় বদলে গেছে। এখন তাদের অধিকাংশই জেহাদের ডাক দিচ্ছে ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে আঘাত হানার একটি উপায় হিসেবে এবং ইসলামের আত্মশুদ্ধির খাতিরে। এখন জেহাদের সফলতার গ্যারান্টি আদৌ আর দেওয়া হচ্ছে না বরং বলা হচ্ছে ঈশ্বর যখন ইচ্ছা করবেন কেবল তখনই বিজয় অর্জিত হবে - তৌফিক মিন আল্লাহ। জনগণের প্রতি এই ধরনের কুসংস্কারাচ্ছন্ন কথাবার্তার গায়ে পরানো রয়েছে আধুনিক রাজনীতির অঙ্গুরীয়। এটা জনসাধারণকে বলছে, "তোমাদেরকে দক্ষতার সাথে ব্যবহার করার সুযোগ দাও আমাকে, কিন্তু প্রশ্ন করো না, পরিবর্তন আসছে না কেন কিংবা কখন বিজয় আসবে"। পরিস্থিতির দুটো পরিবর্তন ইসলামি মৌলবাদী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটের এই রদবদলকে প্রভাবিত করছে : ১. এসব আন্দোলন স্নায়ুযুদ্ধের পরবর্তীকালে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর মধ্যকার বড় বড় মিত্রদের হারিয়েছে ; ২. ইরান ও আফগানিস্তানের ইসলামি রাষ্ট্রগুলোর দেউলিয়াত্ব, যেখানে দারিদ্র, সাম্রাজ্যবাদের উপর নির্ভরশীলতা এবং ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের জীবনে নানা ধরনের সামাজিক অবিচার শুধু যে অব্যাহত রয়ে গেছে তাই নয়, বরং শারীয়া আইন চাপিয়ে দেওয়ার কারণে জনগণের অবস্থা হয়ে উঠেছে আরও খারাপ। এ সকল ইসলামি প্রকল্প প্রমাণ করেছে যে প্রতিশ্রুত ইসলামি সমাজ কোনো বেহেশ্‌তখানা নয় বরং তা হলো পশ্চাদপদতা, দারিদ্র, ভয়ংকর অজ্ঞতা, আর সকল ধরনের বৈষম্য, জাতীয় অধীনতা ও অবমাননা।

জেহাদের পাশাপাশি আরেকটি পরিপূরক ধারণা হলো শাহাদাৎ বা লক্ষ্য অর্জনের জন্য আত্মবলিদান। এই শাহাদাৎ আর বিপ্লবের জন্য একজনের আত্মবলিদানের সাহসিকতা ও প্রস্তুত থাকার বিপ্লবী ধারণার মধ্যে রয়েছে আকাশ পাতাল পার্থক্য। পরেরটা সেবা করে বিজয় অর্জনের সুস্পষ্ট লক্ষ্যের : শ্রমিক, কৃষক আর সকল নিপীড়িত জনগণের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল এবং ব্যক্তিগত পরিভোগ ও শোষনের উৎখাত। শাহাদাৎ-এর ক্ষত্রে জাগতিক রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জন হচ্ছে গৌণ ব্যাপার, "আল্লাহর নৈকট্য লাভ"-এর শীর্ষে পৌঁছানোটাই হচ্ছে আসল। প্রকৃতপক্ষে, ইসলামে জেহাদের সর্বোচ্চ লক্ষ্যই হচ্ছে শাহাদাৎ। শহীদ হওয়াটাই শেষ লক্ষ্য, অন্য জগতে পৌঁছে যাওয়ার প্রস্তুতি আর পরকালে সুখস্বাচ্ছন্দ অর্জনই হলো সবকিছু। একারণেই শাহাদাৎ-এর মতবাদ হচ্ছে প্রতিক্রিশীল।

জনসাধারণ যে ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে পড়ে রয়েছেন তা তাদের জন্য সম্ভাব্য যেকোনও উপায়ে শত্রুকে আঘাত হানার যথেষ্ট কারণ হিসেবে কাজ করে। ফিলিস্তিনের ইসলামি হামাস গ্রুপ বারংবার আত্মঘাতী আক্রমণ পরিচালনা করছে, যা কেবল গণরোষের কিছুটা প্রশমন ঘটাচ্ছে এবং তাদেওকে লাগাতার মিলিত সশস্ত্র সংগ্রামে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী হওয়ার অধিকতর কঠিন পথে চালিত করার বদলে ব্যক্তিগত শৌর্যবীযের নীরব দর্শক করে রাখছে - তা সে শৌর্যবীর্য যতই চমকপ্রদ হোক না কেন। জনসাধারণ যে এই দুনিয়াকে আসলে বদলাতে পারে সে ব্যাপারে হতাশা আর মরিয়া মনোভাবের উপর ভিত্তি করে শাহাদাৎ দাঁড়িয়ে আছে ও সেসবকে লালন করছে। শক্তিশালী শত্রুর বিরুদ্ধে প্রকৃতপক্ষে বিজয় লাভ করা সম্ভব যুদ্ধের এমন রণনীতি সম্পর্কে তাদেরকে আলোকিত করা এবং তাদের দৃষ্টিকে প্রসারিত করার জন্য জনসাধারণের প্রয়োজন এক বিপ্লবী ও বিজ্ঞানসম্মত মতাদর্শের। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর জনসাধারণের জেহাদ আরো বেশি দুঃখ কষ্টই কেবল নিয়ে আসতে পারে। সেই সাথে জেহাদের ভেলকিবাজির কারণে জনসাধারণ প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্রক্ষমতা ও তাদের সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের কব্জা থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারে না। জনসাধারণের বিজ্ঞানসম্মতভাবে দেখতে পারার প্রয়োজন কীভাবে একটা সঠিক রণনীতির মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মতো শক্তিশালী শত্রুকে টেনে নামানো সম্ভব। আর শত্রুকে রণ্নৈতিকভাবে চেপে ধরতে গেলে জনসাধারণের দিক থেকে প্রয়োজন নিজেদের জীবন বিসর্জনসহ বিশাল স্পৃধা ও

আত্মত্যাগের। কিন্তু কারও জীবন দানটাই লক্ষ্য নয়; লক্ষ্য হচ্ছে শত্রুর জীবন ধ্বংস করা এবং শোষণমূলক ব্যবস্থাটা রক্ষাকারী ক্ষমতাকে ধ্বংস করা যার একেবারে মণিকোঠায় রয়েছে রাষ্ট্রক্ষমতা ও তাদের সামরিক বাহিনী।

এই ভয়ঙ্কর পৃথিবী থেকে বাঁচার জন্য এক অলীক স্বপ্নের মধ্যে জনসাধারণকে নিক্ষিপ্ত করা হলো ধর্মীয় মতাদর্শের কাজ। মার্কসবাদ জনসাধারণকে শিক্ষা দেয় যাতে জনসাধারণ বিশ্ব ঠিক যেমনটি আছে সেভাবেই তার মুখোমুখি দাঁড়াতে পারে এবং তাকে সে অনুযায়ী পরিবর্তন করতে পারে। মার্কসবাদ পুরোপুরি বিশ্বের বাস্তবতার ভিত্তির উপর দাঁড়ানো আর সে কারণে একে বদলাতে সক্ষম। মার্কসবাদ জনসাধারণকে শিক্ষা দেয় তাদের সাহায্য করার জন্য কোনো অতি প্রাকৃতিক শক্তির অস্তিত্ব নেই। জনসাধারণের প্রয়োজন এক "যাদু"। কিন্তু এ যাদুটা সর্বদাই ছিল এবং কেবলমাত্র হতে পারে সচেতন মানবিক সৃষ্টি। আর আজ তা সৃষ্টি হতে পারে যদি জনসাধারণ একমাত্র সেই মতাদর্শ ও বিজ্ঞানকে হাতে তুলে নেন যা একান্তই তাদের। পরিপূর্ণ বস্তুবাদী হবার কারণে মার্কসবাদ বিকশিত হয়ে এসেছে এবং বিকশিত হতে থাকবে বিরামহীনভাবে যা ছাড়া এর ঘটবে মৃত্যু। যুগান্তকারী বিপ্লবের মাধ্যমে মার্কসবাদ বিকশিত হয়েছে এবং উৎপাদন ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে মানবজাতি যে ক্রমবিকাশমান জ্ঞান অর্জন করেছে তাকে আত্মস্থ করার প্রকৃয়ার এটা বিকশিত হয়ে উঠেছে মার্কসবাদে-লেলিনবাদে-মাওবাদে। মার্কসবাদ-লেলিনবাদ-মাওবাদ হচ্ছে সর্বহারার শক্তিশালী বৈজ্ঞানিক বিপ্লবী মতাদর্শ। এটা হচ্ছে সেই শ্রেণী যা তার শ্রেষ্ঠতম প্রতিনিধি মার্কস, লেনিন ও মাওয়ের নেতৃত্বে একটা বিজ্ঞানসম্মত বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি এমন রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক লাইন জন্ম দিতে পেরেছে যা কিনা নিপীড়িত জনসাধারণের স্বার্থকে সত্যিকারভাবে প্রতিফলিত করে। শ্রেণী বিভক্ত সমাজের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো নিপীড়িত জনসাধারণকে নিপীড়ক শ্রেণীগুলোর প্রাচীন বা আধুনিক অস্ত্রভান্ডার থেকে আসা কোনো মতাদর্শের উপর নির্ভর করতে হবে না।

.....ক্রমশ.....